بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৮ই মে, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত জুমুআয় আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বরাতে ঘটনাবলী শোনাতে গিয়ে প্রাথমিক যুগে কাদিয়ানের চতুষ্পার্শ্বের অবস্থা কীরূপ ছিল তা বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভ্রমনের সময়ও এক বা দু'ব্যক্তি সফর সঙ্গী হতো আর পথও অত্যন্ত সংকীর্ণ ও ঝোপ-ঝাড় বহুল ছিল। আর এখন কাদিয়ান কীভাবে উন্নতি করছে। আর এই উন্নতি সাধারণ জনবসতির উন্নতির মত নয় বরং খোদা তা'লা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, এই উন্নতি অবশ্যই হবে। বড় বড় রাজপথ এবং প্রধান সড়কের পাশে যে জনবসতি থাকে তা স্বাভাবিকভাবেই উন্নতি করে কিন্তু কাদিয়ান হলো এক কোনায় অবস্থিত। সেখানে যাতায়াতের কোন রাস্তাও ছিল না কিন্তু তাসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা উন্নতির সংবাদ দিয়েছেন আর উন্নতি হয়েছে। বর্তমান কাদিয়ান দেখার জন্য মানুষ সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে আসে বরং কাদিয়ানের সেই অংশ যা জামাতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এতে বিভিন্ন বিল্ডিং এবং অট্টালিকার সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য্যের কারণে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও তা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হয়।

যাহোক, এই উন্নতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কোন কোন স্থানে উন্নতি সংক্রান্ত এই নিদর্শনের কিছুটা বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, দেখ! আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র সত্তায় কত অসাধারণ নিদর্শন দেখিয়েছেন! যদিও তোমরা সে যুগ দেখনি কিন্তু আমরা সে যুগ দেখেছি এবং পেয়েছি। অতএব এমন নিকটতম যুগের নিদর্শন কি কল্পনার চোখে দেখা তোমাদের জন্য বেশি কঠিন কিছু? অন্যান্য নিদর্শনকে বাদ দাও, শুধু মসজিদে মুবারককেই দেখ! মসজিদে মুবারকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি করে স্তম্ভ রয়েছে। এর উত্তরে মসজিদের যে অংশ রয়েছে, এটি ছিল সে যুগের মসজিদ আর নামায পড়ার সময় এতে কখনও একটি আবার কখনও বা দু'টো সারি হত। এই অংশে তিনটি দেয়াল ছিল, একটি দুই জানালা বিশিষ্ট জায়গায় আর সে অংশে ইমাম সাহেব দাঁড়াতেন। তিনি (রা.) বলেন, পুরোনো অংশও সংরক্ষিত আছে। আর যেখানে একটি স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে, একটি দেয়ালও ছিল আর এখানে একটি দরজাও। এ অংশে নামাযীদের দু'টি সারি দাঁড়াতে পারত আর প্রতি সারিতে পাঁচ বা সাত জন দাঁড়ানো সম্ভব হতো। এ অংশে কখনও নামাযীদের একটি সারি হতো আর কখনওবা দু'টো সারি। তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, এ অংশে নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যখন শেষ বা তৃতীয়াংশে নামাযীরা দন্ডায়মান হয় তখন আমাদের আশ্চর্যের কোন সীমা ছিল না। অর্থাৎ পনের বা ষোলতম নামাযী যখন আসে তখন আমরা আশ্চর্য হয়ে বলতে আরম্ভ করি, এখন অনেক মানুষ নামাযের জন্য আসে। তিনি (রা.) বলেন, তোমরা হয়তো মনোযোগ সহকারে সেই জায়গার কথা চিন্তা করনি এবং দেখনি বরং কাদিয়ানে যারা রয়েছে তারাও হয়তো এটি দেখেনি। কিন্তু সেই জায়গা এখনও আছে, যাও আর দেখ। (হুযূর বলেন), স্থানীয়দেরও এ কথা নিয়ে ভাবা উচিত। যারা জলসায় যায় বা এমনিতেই যারা যায়, বছরের বিভিন্ন সময় মানুষ সেখানে গিয়ে থাকে, তারা যদি সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় আর কল্পনার চোখে পুরোনো যুগকে নিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই ঈমানে সতেজতা ফিরে আসবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ

(রা.) বলেন, দেখ! সাহাবীদের রীতি ছিল তারা কখনো কখনো পুরোনো কথা প্রেক্টিক্যালি বা ব্যবহারিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে দেখতেন তাই তোমরাও গিয়ে দেখ। সে অংশকে পৃথক করে দাও যেখানে ইমাম দাঁড়াতেন আর এরপর কল্পনার জগতে সেখানে দেয়াল দাঁড় করাও এবং এরপর যে জায়গা বাকি থাকে সেখানে যেই সারিগুলো হবে কল্পনার জগতে সেগুলোর কথা ভাব। আর তৃতীয় সারি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা ভাবলাম, এটি কত বড় সফলতা এর কথা একটু চিন্তা কর। তারপর ভাব, খোদার কৃপারাজি যখন বর্ষিত হয় তা অবস্থাকে কীভাবে পাল্টে দেয়?

এরপর স্বজনদের অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের মাঝে যে পরিবর্তন এসেছে তার কথা বলতে গিয়ে তিনি (রা.) উল্লেখ করেন, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝেও পরবর্তীতে পরিবর্তন আসে। প্রথমে তারা বিরোধী ছিল এরপর জামাতে যোগ দেয়। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, আমাদের একটি কাঁচা ছাদ ছিল। শৈশবে খেলার জন্য মাঝে মাঝে আমরা সেই ছাদে উঠতাম। সেই ছাদে উঠার জন্য যে সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেতে হত তা মির্যা সুলতান আহমদ মরহুমের ঘরের পাশ দিয়েই উপরে যেত। তখন আমাদের জেঠি সাহেবা যিনি পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, আমাকে দেখে পাঞ্জাবী ভাষায় বলতেন, "যেমন কাক, তেমনই কাকের ছানা"। আমার মা ভারতীয় হওয়ার কারণে আর একই সাথে শৈশবে যেহেতু জ্ঞান স্বল্প হয়ে থাকে তাই পাঞ্জাবী এ বাক্যের অর্থ আমার বোধগম্য ছিল না। এ কারণে একবার মাকে এর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কী? তিনি বলেন, এর অর্থ হলো কাকের ছানাও কাকের মতই হয়ে থাকে। কাক বলতে নাউযুবিল্লাহ্ তোমার পিতাকে বুঝাচ্ছে আর কোকো বলতে তোমাকে বোঝানো হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, দেখ! আমি সে যুগও দেখেছি যখন সেই একই জেঠি সাহেবা যিনি এসব কিছু বলতেন তিনিই কখনও তার ঘরে গেলে বড় শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। আমার জন্য গদি বিছাতেন আর সম্মানের সাথে বসাতেন এবং সশ্রদ্ধভাবে আমার প্রতি মনোযোগী হতেন। যদি আমি বলতাম, আপনি দুর্বল, আপনি বেশি নড়াচড়া করবেন না, কোন কষ্ট করবেন না। তখন তিনি বলতেন, আপনি আমার পীর। অতএব আমি সেই যুগও দেখেছি, যখন আমি কোকো বা কাকের ছানা ছিলাম আর সেই যুগও দেখলাম যখন আমি পীর হয়েছি। আর এসব কিছু প্রত্যক্ষ করে তোমরা বুঝতে পারো যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে চান তখন কীভাবে বদলে দেন। অতএব এমন লোকদের দেখে লাভবান বা কল্যাণমন্ডিত হওয়ার চেষ্টা করো আর নিজের মাঝে সেই পরিবর্তন আনো যা তোমাকে খোদার প্রিয়ভাজন করবে আর তোমরা খোদার জামাতভুক্ত বা দলভুক্ত হবে।

অতএব আমি যেমনটি বলেছি, এসব ঘটনা ঈমানে সতেজতা এবং উন্নতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। এগুলো আমাদের জন্য খোদার নৈকট্য লাভের কারণ হওয়া উচিত। আর এরফলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং সমর্থন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে রয়েছে আর আমাদেরকেও এগুলো হতে অংশ পেতে হবে। আর কাদিয়ানে বসবাসকারী লোকদেরও এ দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের অনেকেই জানে আর এ কথার উল্লেখও হয়ে থাকে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কাদিয়ান একদিন উন্নতি করবে। গত কয়েক খুতবায় আমি বিভিন্ন ঘটনাও শুনিয়েছি যে, কাদিয়ান বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে এ কথা বলেছেন। মসজিদে মুবারকের অবস্থা এবং নামাযীদের যে চিত্র হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অঙ্কন করেছেন তা থেকে দিবালোকের মত এটি সুস্পষ্ট যে, তখন মসজিদ একটি সাধারণ কক্ষের আয়তন থেকে বড় ছিল না। এরপর জামাতের সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মসজিদ বড় হওয়া আর শুধু তাই নয় বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-

এর কাদিয়ানের উন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা এ সবই তাঁর নিদর্শনের অন্তর্গত। যদিও এখনও কাদিয়ান ততটা বিস্তার লাভ করেনি কিন্তু যেখানে আমরা বহু নিদর্শনকে পূর্ণ হতে দেখি সেখানে আমরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি যে, এমন সময় অবশ্যই আসবে যখন পৃথিবী এ নিদর্শনের পূর্ণতাও দেখবে।

আমি যেমনটি বলেছি, আজকের কাদিয়ান সে যুগের কাদিয়ান থেকে অনেকটা বিস্তৃত। যাহোক, "কাদিয়ানের জনবসতি বিস্তৃত হতে হতে বিপাশা পর্যন্ত পৌঁছাবে" এই ভবিষ্যদ্বাণীকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বর্ণনা করে জামাতের সদস্যদের দায়িত্বের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করেছেন। আর এই দায়িত্ব কেবল কাদিয়ানে বসবাসকারীদেরই নয় বরং জামাতের প্রত্যেক সভ্য এবং সদস্যের এটি সামনে রাখা উচিত। প্রধানতঃ এ প্রেক্ষাপটে তিনি নামাযের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটি অদ্ভুত কথা মনে হয়, সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে নামাযের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কথার এটি সুন্দর একটি দিক, একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক ও আঙ্গীক বর্ণনা করে তিনি এর গুরুত্ব আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

বিপাশা নদী পর্যন্ত কাদিয়ান বিস্তৃত হওয়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার স্বপ্নে দেখেছেন, কাদিয়ানের আবাদি বা জনবসতি বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। তিনি বলেন, আমি এই স্বপ্নের অর্থ যা বুঝি তা হলো, কাদিয়ানের জনসংখ্যা অবশ্যই দশ বারো লক্ষ হবে। তখন এ ধারণাই করা হয়েছিল কিন্তু হতে পারে, এরচেয়ে অধিকও হতে পারে। জনসংখ্যা যদি দশ বারো লক্ষ হয় তার অর্থ হলো, জুমুআর জন্য চার লক্ষ মানুষ আসবে। তিনি বলেন, আমার মতে এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে আকসা অনেকটা সম্প্রসারিত হবে। বরং আমাদের এ মসজিদ এতটা সম্প্রসারিত করতে হবে যেন এখানে চার লক্ষ নামাযীর সংকুলান হয়। চার লক্ষ মুসল্লীর একটি মসজিদে সংকুলান হওয়া বড়ই কঠিন। মসজিদে আকসার সম্প্রসারণের কাজও হয়েছে। এটিকে যদি আরো সম্প্রসারিত করা হয় আর চতুষ্পার্শ্বের ঘরগুলোকে যদি ভেঙেও ফেলা হয় তবুও এত বড় সংখ্যায় মুসল্লী সেখানে নামায পড়তে পারবে না। যতটা সম্প্রসারণ করা সম্ভব ছিল তা করা হয়েছে। দারুল মসীহ্‌র যেই ঘরগুলো ছিল সেগুলো সংরক্ষণ করা আবশ্যক ছিল কেননা তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের আবাসিক ভবন বা বিল্ডিং। তাই সবঘর ভেঙে ফেলা বা ভূপাতিত করাও সম্ভব নয়। আর এর পুরোটাও যদি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবুও যেমনটি আমি বলেছি, তিন চার লক্ষ নামাযীর জন্য একত্রে নামায পড়া সম্ভব হবে না। অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি হয়তো একটি সময় এমন আসতে পারে যখন কাদিয়ানে একটি বৃহৎ মসজিদ বানানো যেতে পারে, যাতে তিন-চার লক্ষ নামাযী নামায পড়তে পারবে। যাহোক, তখন তাঁর সামনে মসজিদে আকসাই ছিল যার কথা তিনি বর্ণনা করছেন। মসজিদে আকসা সম্পর্কেই তিনি আরো বলেছেন, এ মসজিদ আমাদেরকে এতটা সম্প্রসারিত করতে হবে যেন চার লক্ষ নামাযীর এতে সংকুলান হয়। এই উদ্দেশ্যে এটিকে চতুর্দিকে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। তিনি (রা.) আরো বলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি এই খুতবা দিচ্ছি এটি সে অংশের বাইরে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ছিল। সেই মসজিদ বর্তমান মসজিদের খুব সম্ভব এক দশমাংশ ছিল। দেখ! আল্লাহ্ তা'লার কতবড় অনুগ্রহ যে, মানুষের মসজিদ খালি পড়ে থাকে আর আমরা আমাদের মসজিদকে বড় করলেও সেগুলো আবার ছোট হয়ে যায়। এমনকি মানুষ মসজিদে নামাযের জায়গা পায় না।

এরপর তিনি (রা.) তাঁর সেই ঘটনা শুনিয়েছেন যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, একবার এমন এক কাজ আমার দ্বারা সাধিত হয়েছে যার কারণে আমি খুবই ভীত-ত্রস্ত ছিলাম।

তিনি (রা.) বলেন, এটি আমার ভুল ছিল এবং আমি ধরা পড়ি। একই সাথে তিনি বলেন, আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ কেননা, স্বল্প সময়ের ভেতরেই আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি। তিনি (রা.) বলেন, সেই ঘটনাটি হলো, জুমুআর জন্য যাচ্ছিলাম। তখন আমার বয়স পনেরো বা ষোল বছর ছিল। ঘর থেকে যখন বের হই তখন এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে ফিরে আসছিল। সে বলে যে, মসজিদে তো নামায পড়ার কোন জায়গা নেই। তার এই কথা শুনে আমিও ফিরে আসি। তিনি বলেন, আমি এসে যোহরের নামায পড়ে নেই। আমার দুর্ভাগ্য কেননা, আমার যাচাই করে দেখা উচিত ছিলো যে, সত্যিই মসজিদ পরিপূর্ণ কি-না, সেখানে দাঁড়ানো বা বসার আদৌ জায়গা আছে কিনা। যাহোক তিনি (রা.) বলেন, খোদার এটি বিশেষ অনুগ্রহ , আমি বাল্যকাল থেকেই নামাযের প্রতি সচেতন। আমি আজ পর্যন্ত এক বেলার নামাযও নষ্ট হতে দেইনি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করতেন না যে, তুমি নামায পড়েছ কি-না? আমার মনে আছে, আমি যখন বয়সের একাদশতম বছরে ছিলাম একদিন আমি দোহা বা ইশরাকের নামাযের সময় ওযু করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোট পরিধান করি আর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে খুব কাঁদি এবং এই অঙ্গীকার করি যে, ভবিষ্যতে আমি আর কখনও নামায ছাড়বো না। আর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে এই অঙ্গীকারের পর আমি আর কখনও নামায ছাড়িনি। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমি যেহেতু বালক ছিলাম আর বাল্যকালে খেলাধুলার কারণে অনেক সময় বাজামাত নামাযে আলস্য হয়ে যায় তাই কেউ একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আপনি তাকে বোঝান সে যেন পুরো আন্তরিকতা ও সচেতনতার সাথে বাজামাত নামায আদায় করে। তিনি (রা.) বলেন, মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব বয়সে আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট। বাল্যকালে আমরা একসাথে খেলাধুলা করতাম। আমাদের নানাজান মীর নাসের নওয়াব সাহেব যেহেতু প্রকৃতিগতভাবেই রাগী ছিলেন তাই তিনি মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের সাথে রাগ করতেন আর কঠোরভাবে তাকে নামাযের কথা বলতেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও সেকথা জানতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যখন কেউ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একজন মীর সাহেবের নামায পড়ে অর্থাৎ মীর ইসহাক সাহেব সম্পর্কে বলেন, সে তার আব্বার নামায পড়ে কিন্তু আমি চাইনা যে, দ্বিতীয় জনও আমার নামায পড়ুক। আমি এটিই চাই সে যেন আল্লাহ্‌র নামায পড়ে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে কখনও নামায পড়তে বলেন নি। আমি নিজেই সকল নামায সময়মত পড়তাম।

(হুযূর বলেন), এর অর্থ যেন ছেলে-মেয়েরা এটি না করে যে, পিতা-মাতা যেন আমাদেরকে নামাযের জন্য না বলেন বা পিতা-মাতাও যেন একথা না ভাবেন যে, সন্তানদের নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক উচ্চ ধারণা ছিলো। একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিও জানতেন, তিনিই মুসলেহ্ মওউদ হতে যাচ্ছেন। তাই তাঁর এ বিশ্বাসও ছিল যে, তিনি আল্লাহ্‌র খাতিরে নামায পড়েন এবং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার সংশোধন করা অব্যাহত রাখবেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এরও নিজের এই যে আচরণ, এগারো বছর বয়সে নামাযের জন্য বিগলিত চিত্তে দোয়া করা, এটিও এ কথারই প্রমাণ যে, নামাযের প্রতি তার সুগভীর মনোযোগ ছিল। যাহোক, এরপর তিনি (রা.) বলেন, সেদিন হয়তো আল্লাহ্ তা'লা আমার উদাসীনতা দূর করতে চেয়েছেন। অনেক সময় বাজামাত নামায পড়া হয় না এমননি সামান্য হলেও আল্লাহ্ তা দূর করতে চেয়েছেন। যখন আমি জুমুআ না পড়ে বাসায় ফিরে আসি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে দেখে বলেন, মাহমুদ এদিকে আস। আমি যাওয়ার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি জুমুআ পড়তে যাওনি?

আমি বললাম, আমি গিয়েছিলাম কিন্তু জানতে পারলাম, মসজিদ কানায় কানায় ভরা, সেখানে নামাযের কোন জায়গা নেই। আমি কথার ছলে যদিও এই কথা বলে দেই কিন্তু মনেমনে এই ভেবে খুবই ভীত ও ত্রস্ত ছিলাম, অন্যের কথায় কেন বিশ্বাস করলাম। জানি না সে সত্য বলেছে নাকি মিথ্যা। যদি সে সত্য বলে থাকে তাহলে তো বেঁচে যাব কিন্তু যদি সে মিথ্যা বলে থাকে আর যা আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে তুলে ধরেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, কেন তুমি মিথ্যা বলেছ? যাহোক তিনি (রা.) বলেন, আমি খুবই ভয়ে ভয়ে ছিলাম, না জানি আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কী বলবেন। ততক্ষণে নামায পড়ে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখতে আসেন। তাঁর অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তখন কিডনীর ব্যাথা ছিল তাই তিনি জুমুয়ায় যান নি। আমি তখন আশেপাশেই পায়চারী করছিলাম, দেখি আজ কী হয়। তিনি আসা মাত্রই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আজকের জুমুআয় কি মানুষের উপস্থিতি বেশি ছিল? মসজিদে কি নামায পড়ার কোন জায়গা ছিল না? তিনি (রা.) বলেন, একথা শুনতেই আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, জানিনা সেই ব্যক্তি আমার সাথে সত্য নাকি মিথ্যা বলেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমার সম্মান রেখেছেন। মৌলভী আব্দুল করীম মরহুম খোদার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতার চেতনায় সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, হুযূর আল্লাহ্র অনেক বড় অনুগ্রহ হয়েছে। মসজিদ নামাযীতে কানায় কানায় ভরা ছিল। সেখানে বসার মত বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। তখন আমি বুঝতে পেরেছি, সেই আহমদী সত্য বলেছেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উন্নতির এই মাধ্যমই নির্ধারণ করেছেন যে, আমাদের মসজিদের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি পায় আর সব সময় যেন আবাদ থাকে। যতদিন তোমরা মসজিদ আবাদ রাখবে ততদিন তোমরাও আবাদ থাকবে এবং উন্নতি করবে আর যদি তোমরা মসজিদ ছেড়ে দাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদের পরিত্যাগ করবেন।

অতএব কাদিয়ানের বিস্তৃতি, আহমদীয়া জামাতের উন্নতি এবং বিস্তৃতি কেবল আয়তনের বা সংখ্যার দিক থেকেই নয় বরং এই বিস্তৃতি নির্ভর করে আমাদের গৃহ আবাদ করার পাশাপাশি আল্লাহ্র ঘরকে আবাদ করার মাঝে। তাই প্রত্যেক আহমদী সে কাদিয়ানের অধিবাসী হোক বা রাবওয়ার তাকে যদি রাবওয়া বা কাদিয়ানের উন্নতি দেখতে হয় বা পৃথিবীর যে কোন দেশের বসবাসকারীই হোক না কেন জামাতের উন্নতির যদি তাকে অংশ হতে হয় এবং জামাতের উন্নতি দেখতে হয় তাহলে নিজেদের উন্নতির পাশাপাশি মসজিদ আবাদ রাখাও একান্ত আবশ্যক। কেননা এই উন্নতি খোদা তা'লার কৃপায় হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও অনুগ্রহ তাঁর গৃহ আবাদ করার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।

অতএব আজ আমরা যেখানেই মসজিদ নির্মাণের কথা বলি, সর্বত্র আমাদের চেষ্টা করা উচিত নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে মসজিদ যেন ছোট হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে একনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত যেন খোদা কখনও আমাদের পরিত্যাগ না করেন আর আমরা নিজেরাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হতে দেখি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এর প্রেক্ষাপটে কাদিয়ানের অবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তখন কাদিয়ানের অবস্থা কেমন ছিল? তিনি (রা.) বলেন, আমি এখন সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছি যা কাদিয়ানের উন্নতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানানো হয়েছে, কাদিয়ান গ্রাম উন্নতি করতে করতে মুম্বাই বা কলিকাতার মত বড় শহরে পরিণত হবে অর্থাৎ যেন এর জনসংখ্যা নয়

দশ লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর সেই সময়কার পরিস্থিতি অনুসারে তিনি এই ধারণা করেছেন যে, এর জনবসতি উত্তর থেকে দক্ষিণে সম্প্রসারিত হতে হতে বিপাশা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যা কাদিয়ান থেকে নয় মাইল দূরে প্রবাহমান একটি নদীর নাম। এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন ছাপা হয় তখন কাদিয়ানের যে চিত্র ছিল তাহলো, তখন কাদিয়ানের জনবসতি ছিল দুই হাজারের কাছাকাছি। কয়েকটি পাকা ঘর ছাড়া বাকি সব ঘরই ছিল মাটির। ঘর ভাড়া এত যৎসামান্য ছিল যে, মাসিক চার-পাঁচ আনায় ঘর ভাড়া পাওয়া যেত। আর জমি এত সস্তা ছিল যে, দশ বারো রূপীতে বসবাস গৃহ বানানোর জন্য জমি ক্রয় করা সম্ভব হত। বাজারের চিত্র হলো, দুই তিন রূপীর আটাও এক সাথে পাওয়া যেত না। মানুষ যেহেতু কৃষক শ্রেণীর ছিল তাই তারা আটার পরিবর্তে গম রাখত আর গম পিষে রুটি বানাত। তাদের কাছে চাক্কি বা যাঁতা ছিল। পড়ালেখার জন্য একটি সরকারি মাদ্রাসা ছিল যা প্রাইমারি পর্যন্ত ছিল। এর শিক্ষক যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে নিয়ে ডাক বিভাগের কাজও করে দিত। ডাক সপ্তাহে একবার আসত। সব বাড়ি-ঘর ছিল গ্রামের চার দেয়ালের মাঝে। এই ভবিষ্যদ্বাণী বাহ্যিক অর্থে পূর্ণ হওয়ার কোন উপকরণই ছিল না কেননা, কাদিয়ান রেল স্টেশন থেকেও এগার মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এর রাস্তাঘাট ছিল সম্পূর্ণরূপে মাটির। আর যেসব দেশে রেল গাড়ী বা রেল লাইন থাকে সেখানে লাইনের চতুষ্পার্শ্বে যে জনবসতি থাকে সেগুলোই উন্নতি করে। কাদিয়ানে কোন কল-কারখানাও ছিল না যার ফলে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শহরের জনবসতি বৃদ্ধি পেতে পারত। কোন সরকারী বিভাগও কাদিয়ানে ছিল না যার কারণে কাদিয়ান উন্নতি করতে পারত। জেলা বা তহসিলেরও কোন বিভাগ ছিল না এমনকি পুলিশের চৌকি পর্যন্ত ছিল না। কাদিয়ানে কোন মণ্ডি বা বাজারও ছিল না যে কারণে এখানকার বসতি সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারত। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুরীদ বা ভক্তের সংখ্যাও কয়েক'শ এর অধিক ছিল না যাদের নির্দেশ দিয়ে এখানে এনে জনবসতি স্থাপন করতে বাধ্য করলে শহর আবাদ হতে পারত। যদিও কাদিয়ান এখন পর্যন্ত বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে উন্নতি করেছে; এখন এ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে যে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ভাববে, আজকের কাদিয়ানকে দেখলেই একজন বিবেকবান ব্যক্তি এই কথাকে নিদর্শন আখ্যায়িত করবে, অবশ্য যদি বিবেক ও ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টি থাকে। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, এক আহমদীর জন্য এই কথাগুলো অবশ্যই ঈমান বৃদ্ধির কারণ কিন্তু অ-আহমদীদের মনোযোগও এদিকে নিবদ্ধ হয় আর অনেক গবেষক এখান থেকে যায়। একজন অধ্যাপক যাকে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়, তিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণার জন্য এবং আহমদীয়াত যে প্রকৃত ইসলাম উপস্থাপন করে সেটি কী তা দেখার জন্য কাদিয়ান যান। এরপর তিনি তার ইম্প্রেশন বা অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো এমন যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়, অমুসলমানরাও কীভাবে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব উদঘাটন করে। যাহোক, তার এই প্রবন্ধ এক সময় ইনশাআল্লাহ্ ছেপে যাবে।

পুনরায় একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই দৃশ্য যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ানের উন্নতি সংক্রান্ত দেখেছেন সে সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হবে, এটি আবশ্যিক নয় যে, কাদিয়ানের উন্নতির সবকিছু তাঁকে দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ আবশ্যকীয় বিষয় হলো তার চেয়ে কম উন্নতি যেন না হয়। উন্নতি যদি বেশি হয় তাহলে তা ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার পথে কোন অন্তরায় হবে না বরং এটি এর মহিমা আরও বৃদ্ধি করবে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে স্বপ্ন দেখেছেন এর অর্থ এটি নয় যে, কাদিয়ান এর বেশী আর বিস্তার লাভ করবে না। হতে পারে কোন

সময় কাদিয়ান এত উন্নতি করবে যে, বিপাশা নদী কাদিয়ানের ভেতর দিয়ে প্রবাহমান একটি নালার মত দেখাবে এবং কাদিয়ানের জনবসতি বিপাশা নদী ছাড়িয়ে হুশিয়ারপুর জেলার দিকে বিস্তৃত হবে।

কাদিয়ানে যেখানে জামাতী ভবনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিভিন্ন দপ্তর ছাড়াও কর্মীদের আবাসিক গৃহ এবং ফ্ল্যাট নির্মিত হচ্ছে, অন্যান্য বিল্ডিং বা ভবন নির্মিত হচ্ছে সেখানে কাদিয়ানের অধিবাসীদেরও স্বচ্ছলতায় ধন্য করে আল্লাহ্ তা'লা বড় ঘর বানানোর তৌফিক দিচ্ছেন। এছাড়া ভারতের সঙ্গতি সম্পন্ন আহমদীরাও কাদিয়ানে নিজেদের বিল্ডিং এবং গৃহ নির্মাণ করছে। একইসাথে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী আহমদীদেরও এদিকে মনোযোগ রয়েছে। কিন্তু মৌলিক কথা তাই যা প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিগোচর রাখা চাই, সব উন্নতির রহস্য এবং উন্নতির অংশ হওয়ার রহস্য হলো, খোদার গৃহ আবাদ করা এবং তাঁর গৃহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। যেখানেই কোন ব্যক্তি খোদা তা'লাকে পরিত্যাগ করবে সেখানে খোদা তা'লাও তাকে পরিত্যাগ করবেন। আর এটি এখন শুধু কাদিয়ানের উন্নতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় নয় বরং জামাতের সামগ্রীক উন্নতিও এর সাথে সম্পৃক্ত। নিজেদের মসজিদকে নামাযীদের উপস্থিতির মাধ্যমে ছোট করে দিন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের প্রত্যাশা রাখুন।

আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, কেবল কাদিয়ানের উন্নতিই নয় বরং জামাতের সকল প্রকার উন্নতির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমরা যদি একটি নিদর্শন পূর্ণ হতে দেখি তাহলে দ্বিতীয় নিদর্শনের পরিপূর্ণতার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। কোন সময় কোন কোন পরিস্থিতির কারণে কিছু মানুষের হৃদয়ে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা দানা বাঁধে। নিজেরা কিছু ধারণা এবং অনুমান করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, এখন অমুক কাজ অমুক ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হয়ে যাবে। অনেকেই কঠিন পরিস্থিতি এবং সমস্যা দেখে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়। পাকিস্তানে তো দুঃশ্চিন্তা রয়েছেই। আজই পাকিস্তান থেকে সংবাদ এসেছে, পাঞ্জাব সরকার নিজেদের ধারণা অনুসারে ফির্কাবাজী অবসানের নামে বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির বা বিভিন্ন দলের কিছু বই-পুস্তক বাজেয়াপ্ত করেছে যাতে আমাদের জামাতী বই-পুস্তকও রয়েছে যেগুলোর ফির্কাবাজীর সাথে কোন সম্পৃক্ততাই নেই। যেমন আল্ ফযল, রূহানী খাযায়েন ইত্যাদি। অশিক্ষিত মৌলভীদের কথায় সরকার এগুলো বাজেয়াপ্ত করেছে। মৌলভীরা যা বলে সরকার তাই মানে। কখনও তা পাঠ করে এটি চিন্তা করবে না যে, কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বই-পুস্তকে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার আকর্ষণীয় চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং সবসময় ইসলামের সুরক্ষার কাজই করেছেন আর মৌলভী, মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সঠিক পথের পানে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যাহোক, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয় আর এর প্রয়োজনও নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বারবার বলেছেন, **"ইন্নি মা'আল আফওয়াজে আতিকা বাগতাতান"** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য আকস্মিকভাবে আসবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, তোমরা আজকে ভাবতেই পারবে না যে, সেই সাহায্য কখন আসবে। তোমরা কালও ভাবতে পারবে না, সেই সাহায্য কবে আসবে। তোমরা তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে আর হয়তো ভাববে, এখনও গন্তব্য অনেক দূরে, জানিনা কত দূর যেতে হবে। ফজরের নামায পড়াকালে সমস্যার পর সমস্যা তোমাদের চোখে পড়বে কিন্তু সূর্যের আলো চোখে পড়তেই আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর তোমাদের শত্রুদের জন্য সর্বত্র সমস্যা আর সমস্যাই বিরাজ করবে। তাই নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় রাখুন, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক বন্ধনে

আবদ্ধ থাকুন আর ঈমানের দৃঢ়তার জন্য দোয়াও অব্যাহত রাখুন। সূর্য উদিত হবে, ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই হবে। আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে, আর অবশ্যই আসবে।

এখন আমি বিবিধ উদ্বৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। ওয়াক্‌ফে নও ক্লাশে একটি মেয়ে প্রশ্ন করেছিল, কবরে ফুলের চাঁদর চড়ালে বা ফুল রাখলে অসুবিধা কি? এটি বৈধ কি না? আমি তখন তাকে উত্তর দিয়েছিলাম, এগুলো বৃথা কাজ, বিদা'ত, বর্জন করা উচিত। এগুলোর কোন উপকারী দিক নেই। মানুষ কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাযারেও অনেক সময় এমন আচরণ প্রদর্শন করে। পূর্বেও করতো আর এখনও করে তাই এখন সেখানে লোহার বেড়া লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যেন এই কুপ্রথা বা বিদা'তের প্রসার না ঘটতে পারে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার এই ঘটনা যখন তাঁর দৃষ্টিতে আসে তখন এ সম্পর্কে বলেন, আমাকে বলা হয়েছে কিছু মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবর থেকে বরকতের জন্য মাটি নিয়ে যায়। কিছু মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাযারে ফুল বিছিয়ে দেয়। এগুলো সব বৃথা কার্যকলাপ। এতে কোন লাভ হয় না বরং ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কবরে ফুল বিছালে লাশের কি লাভ হতে পারে? তাদের আত্মা তো সেখানে থাকে না বরং অন্যত্র থেকে থাকে। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আত্মার এই বাহ্যিক কবরের সাথেও এক প্রকার সংশ্লিষ্টতা রয়ে যায়। এ বিষয়টিও বুঝতে হবে। মৃত ব্যক্তির আত্মা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ তা'লা এই বাহ্যিক কবরের সাথেও এক অর্থে তাদের সম্পৃক্ত রাখেন। যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার এক পুণ্যবান ব্যক্তির কবরে দোয়া করার জন্য গিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি যখন দোয়া করছিলাম তখন কবরস্থ ব্যক্তি কবর থেকে বেরিয়ে আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ে। কিন্তু এর অর্থ এও নয় যে, তার আত্মা সেই মাটির কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে বরং বাহ্যিক এক সম্পর্কের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন সেই মাটির কবরে দোয়ার জন্য দন্ডায়মান হন তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই বুযূর্গকে তার প্রকৃত কবর থেকে বের হয়ে তাঁর (আ.) কাছে আসার অনুমতি দেন। অর্থাৎ সেই কবর যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"সুম্মা আমাতাহু ফা আকবারা"** অর্থাৎ এরপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং তাকে কবরস্থ করেছেন। মৃত্যুর পর সেই কবরে মানুষের আত্মা রাখা হয় অর্থাৎ সেই কবরের সাথে তার সম্পর্ক থেকে যায়। আর সেই সম্পর্কের বরাতে তার জন্য দোয়া হয়ে থাকে। বাহ্যিক কবরের সাথেও আত্মার বা দেহের সম্পর্ক থাকে এবং সেই অনুসারে দোয়া হয়ে থাকে নতুবা কবরে ফুল দেয়া কোন মূল্যই রাখে না। সেই পুণ্যবান ব্যক্তির জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে দোয়ার আবেগ এবং প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্যবান ব্যক্তিকে অর্থাৎ তার আত্মাকে তার আসল স্থান থেকে সেই কবর পর্যন্ত পাঠিয়েছেন ফলে তিনি কবর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তিনি (আ.) দিব্যদর্শনে তাকে দেখেছেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেখানকার পুরোনো লোকদের কাছে সেই পুণ্যবান ব্যক্তির চেহারা বা অবয়বের কথা জিজ্ঞেস করেছেন যা পরম্পরাগতভাবে চলে আসছিল। বর্ণনা অনুসারে তা অবিকল তাই ছিল যা তিনি (আ.) দেখেছেন। চোখ এবং চেহারার ছাপ আর অবয়ব ইত্যাদি সব একই ছিল।

অতএব ফুল ইত্যাদিতে দেহের বা আত্মার কোন লাভ হয় না। অবশ্য দোয়া লাভজনক হয়ে থাকে যা করা উচিত। পৃথিবীতে আমরা দেখি, মানুষ কবরে সমাহিত হওয়ার পর মাটিতে মিশে যায় আর এটিই প্রকৃতির নিয়ম। যেখানে এই হলো বাস্তবতা সেখানে বাহ্যিক বা জাগতিক ফুলের সৌরভ তাকে কি-ইবা দিতে পারে। আত্মার যতটুকু সম্পর্ক আছে তাতো শাস্তি এবং পুরষ্কার লাভের জন্য, আত্মা আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়ে গেছে এবং হয়ে যায়। এই আত্মার কল্যাণের জন্য এখন দোয়া

করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করুণা করেন। কোন প্রকার মুশরিকানা বা পৌত্তলিকতা প্রসূত কাজ কবরে গিয়ে করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদীরা তা করে না। কিন্তু অনেক সময় এমনটি হয়ে যায়, এখানেও অনেকেই কবরে ফুল বিছিয়ে থাকে। এগুলো উদ্দেশ্যবিহীন কাজ। আমাদের লোকদের এমনটি করা উচিত নয়।

আরো একটি ঘটনা যার কথা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উল্লেখ করেছেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই ইসলামী নীতি দর্শন লেখা এবং পঠিত হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অদ্ভুত এক ঘটনা। কিছু বক্র স্বভাবের মানুষের প্রকৃতি কেমন তা এর মাধ্যমে জানা যায়। এটি নয় যে, তারা পরে বক্র হয় বরং তারা পূর্ব হতেই বক্র হয়ে থাকে। এ কারণেই তাদের পরিণাম শুভ হয় না। তিনি (রা.) বলেন, ১৮৯৭ সনে যখন লাহোরে সর্বধর্ম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হয় আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এতে প্রবন্ধ উপস্থাপনের অনুরোধ জানানো হয়। খাজা সাহেবই সেই বার্তা নিয়ে আসেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই সময় দাস্তে অর্থাৎ পেটের পীড়ায় ভুগছিলেন। এরূপ কষ্ট সত্ত্বেও তিনি প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন এবং খোদা প্রদত্ত তৌফিকে লেখার কাজ সমাপ্ত করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন খাজা সাহেবকে এই প্রবন্ধ হস্তান্তর করেন, তিনি এ সম্পর্কে অনেক নৈরাশ্য প্রকাশ করেন আর এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে, এই প্রবন্ধ গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখা হবে না বা গুরুত্ব দেয়া হবে না, অনর্থক হাসির খোরাক হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানিয়েছিলেন, **"এই প্রবন্ধ অবশ্যই জয়যুক্ত হয়েছে"**। তিনি অনুষ্ঠানের পূর্বেই এই ইলহাম সম্পর্কে বিজ্ঞাপন লিখে লাহোরে প্রচার করা আবশ্যক মনে করেন আর বিজ্ঞাপন লিখে খাজা সাহেবকে দেন পুরো লাহোরে প্রচার এবং বিভিন্ন জায়গায় লাগানোর জন্য। এছাড়া খাজা সাহেবকে তিনি নিশ্চয়তাও দিয়েছেন এবং আশ্বস্তও করেছেন কিন্তু খাজা সাহেব যেহেতু সিদ্ধান্ত করে বসেছিলেন যে, তাঁর প্রবন্ধ অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধ নাউযুবিল্লাহ্ বাজে এবং বৃথা তাই তিনি নিজেও বিজ্ঞাপন ছাপেন নি এবং মানুষকেও ছাপতে দেননি। কিন্তু মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে কিছু মানুষ জোর দিলে তিনি রাতে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে কিছু বিজ্ঞাপন দেয়ালের উঁচু জায়গায় লাগিয়ে দেন যেন মানুষ পড়তে না পারে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যেন বলা যায় যে, তাঁর নির্দেশ মান্য করা হয়েছে। কেননা সেই প্রবন্ধ যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, এটি জয়যুক্ত হবে খাজা সাহেবের মতে তা এমন বড় বড় গবেষকদের অধিবেশনে উপস্থাপনের যোগ্য ছিল না। কিন্তু অবশেষে সেই দিন আসে যেদিন এটি শোনানোর পালা ছিল। যখন শোনানো আরম্ভ হয় তখন কয়েক মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই, আমরা সবাই জানি আর ইতিহাসেও এর উল্লেখ রয়েছে, মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে থাকে এবং মনে হয় যেন তাদের ওপর জাদু করা হয়েছে। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও মানুষের আগ্রহে কোন ভাটা পড়ে নি। আরও সময় বৃদ্ধি করা হয়। তাও পর্যাপ্ত ছিল না। অবশেষে শ্রোতাদের অনুরোধে জলসার সময় একদিন বর্ধিত করা হয়। সেদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেকচারের বাকি অংশ সমাপ্ত করা হয়। শত্রু-মিত্র সকলেই সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করেছে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেকচার সবচেয়ে উন্নত ছিল এবং আল্লাহ্‌র কথা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীকে খাজা সাহেবের ঈমানের দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন রাখে। এখন আমরা এই ঘটনাগুলো শোনাই। কিন্তু কোথায় সেই প্রভাব যা প্রবন্ধ পঠিত হওয়ার পূর্বে বিজ্ঞাপন প্রচার করলে সৃষ্টি হতো আর কোথায় এই প্রভাব। সেক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীর যে গুরুত্ব প্রকাশিত হতো তা খুব সহজেই অনুমেয়। বলা হয় খাজা সাহেব অনেক বড় শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, উকীল ছিলেন কিন্তু অহংকার যদি হৃদয়ে দানা বাঁধে আর আল্লাহ্‌র কথার পূর্বে মানুষ যদি নিজের বুদ্ধি ও মেধাকেই কিছু

একটা মনে করে বসে তাহলে মানুষের বোধ-বুদ্ধি বা বিবেকের ওপর এমনভাবে পর্দা পড়ে যায় যা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে নির্বোধ করে তুলে। তখন সে আর কোন কাজের থাকে না। এটি এমন একটি প্রবন্ধ যা আজও শিক্ষিত অ-আহমদীদের যখন আমরা দেই তারা এর জ্ঞানগত মান এবং ইসলামী শিক্ষায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বরং অনেকেই এমনও আছে যাদের আমি যখন জিজ্ঞেস করি, কীভাবে আহমদী হয়েছ? তখন তারা উত্তরে বলে, আমরা ইসলামী নীতি দর্শন গ্রন্থ পাঠ করে আহমদী হয়েছি। কিন্তু খাজা সাহেবের দৃষ্টিতে এটি হাসি-ঠাট্টার কারণ হতে পারত। তার ধৃষ্টতা এত বেশি ছিল যে, এক দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবী আবার একই সাথে তাঁর নির্দেশকেও লঙ্ঘন করা হচ্ছে। কিন্তু খোদার ব্যবহারিক আচরণ অর্থাৎ পরে মানুষ যে সাধুবাদ জানিয়েছে তা তার মুখে চপেটাঘাতের কারণ হয়েছে।

আহমদীদের মাঝে ধর্মীয় আত্মাভিমানের মান কীরূপ হওয়া উচিত এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। কোন রিপোর্ট আসে, কিছু মানুষ এমন জায়গায় গিয়েছে যেখানে অ-আহমদীরা বুযূর্গদেরকে ও জামাতকে গালি দিচ্ছিল। তিনি (রা.) বলেন, প্রধানতঃ এমন মজলিস বা বৈঠক যেখানে গালি দেয়া হয় সেখানে মানুষ যাবে কেন? যেখানে বিরোধীরা বক্তৃতা করে কিছু আহমদী তা শোনার জন্য চলে যায়। তাদের সেখানে যাওয়াই বলে, তারা সত্যিকার আত্মাভিমান রাখে না। কারো হৃদয়ে কখনও এই বাসনা জাগ্রত হয়েছে কী যে, অমুক স্থানে আমার পিতাকে গালি দেয়া হচ্ছে, আমি গিয়ে শুনে আসি। বা কেউ যদি কাউকে সংবাদ দেয় যে, অমুক স্থানে তোমার মাকে গালি দেয়া হচ্ছে আর তখনই সে জুতা হাতে নিয়ে সেদিকে ছুটবে যে, চল শুনি কত চমকপ্রদ গালি দেয়া হচ্ছে। যদি তোমাদের মাঝে প্রকৃত আত্মাভিমান থাকে তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বা তোমাদের ইমাম বা অন্যান্য বুযূর্গদের সম্পর্কে গালি শোনার জন্য যাও কেন। তোমাদের সেখানে যাওয়াই বলছে, তোমাদের মাঝে প্রকৃত আত্মাভিমান নেই বা অতি নিম্নমানের আত্মাভিমান রয়েছে। আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আর্যরা লাহোরে একটি জলসার ব্যবস্থা করে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অনুরোধ করে যে, আপনি সেখানে পড়ার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখুন। তিনি (আ.) বলেন, এদের অভ্যাসের কথা আমাদের খুব ভালভাবে জানা আছে। তারা অবশ্যই গালি দিবে। তাই আমরা তাদের জলসায় অংশগ্রহণ করি না। কিন্তু ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব এবং লাহোরের আরো কিছু আহমদী যাদেরকে আর্যরা তোষামোদ করে সম্মত করে নিয়েছিল; তারা বলে, এই দেশে এখন যেহেতু রাজনৈতিক আন্দোলন সূচিত হয়েছে তাই আর্যদের আচার আচরণ বদলে গেছে। আপনি অবশ্যই প্রবন্ধ লিখুন। ইসলামের অনেক উপকার হবে। এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঘৃণা সত্ত্বেও তাদের কথা মেনে নেন আর প্রবন্ধ লেখেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে তা পড়ার জন্য লাহোর পাঠান। তিনি (রা.) বলেন, আমিও সাথে যাই এবং আরো কিছু বন্ধু সাথে যায়। সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। তাতে সব কথা ছিল প্রেম-প্রীতি এবং ভালবাসাপূর্ণ। এরপর এক আর্য প্রবন্ধ পাঠ করে যাতে মহানবী (সা.)-কে চরম গালি দেয়া হয় আর সেই সকল নোংরা আপত্তি করা হয় যা খ্রিষ্টান এবং আর্যরা করে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, আমার এই ঔদাসীন্যের জন্য আজ পর্যন্ত আক্ষেপ হয়। আমার সাথে আরো এক ব্যক্তি বসে ছিলেন। ঠিক মনে নেই তিনি কে ছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আর্য বক্তা যখন নোংরামির বেসাতি আরম্ভ করে তখন আমি উঠে পড়লাম এবং বললাম, আমার পক্ষে এটি শোনা সম্ভব নয়। আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু সেই ব্যক্তি যে আমার পাশে বসেছিল, আমাকে বলল, হযরত মৌলভী সাহেব এবং জামাতের অন্যান্য আলেমরা বসে আছেন। এটি যদি চলে

যাওয়া সঙ্গত হতো তবে তারাও কি উঠতেন না? আমি বললাম, তাদের হৃদয়ে যা আছে তা তারা জানেন কিন্তু আমি এটি সহ্য করতে পারব না। সে ব্যক্তি বলল, রাস্তা বন্ধ। দরজায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আপনি মাঝ থেকে উঠে গেলে হৈ চৈ হবে, বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। নিরবে বসে থাকুন। আমি তার কথায় পড়ে নিরবে বসে থাকলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার আক্ষেপ হয়, আল্লাহ্ তা'লা যখন আমার হৃদয়ে একটি নেক প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন তখন আমি কেন উঠে পড়লাম না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন একথা শোনেন যে, জলসায় মহানবী (সা.)-কে গালি দেয়া হয়েছে তখন তিনি খুবই রাগান্বিত এবং মর্মাহত হন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের সাথেও রাগ করেন এবং বলেন, আপনারা কেন প্রতিবাদ করে সেখান থেকে চলে আসেন নি। আপনার এটি সহ্য করা সমীচিন হয়নি। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেব সেই জলসায় যান নি। আমার মনে আছে হাঁটতে হাঁটতে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথাগুলোর সত্যায়নও করছিলেন আর একই সাথে এটিও বলছিলেন যে, যহুল হয়ে গেছে অর্থাৎ ভুল হয়ে গেছে। তিনি (রা.) বলেন, যহুল শব্দ আমি তার কাছে প্রথমবার শুনেছি। বারবার এমনভাবে বলছিলেন যে, শুনে হাসি পাচ্ছিল। যহুল শব্দের অর্থ হলো ভুল হয়ে গেছে। তিনি আক্ষেপও করছিলেন আর একই সাথে এটিও বলছিলেন যে, যহুল হয়ে গেছে অর্থাৎ ভুল হয়ে গেছে। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিছুক্ষণ পর তাদের ক্ষমা করে দেন।

তিনি (রা.) বলেন, আমাদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রায় বা সিদ্ধান্ত রয়েছে। অতএব সবসময় সাবধান থাকা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু অনেক সময় এসব গালি পরবর্তীতে পুস্তিকা আকারে ছাপিয়ে দিলে কোন অসুবিধা নেই কেননা এগুলো জামাতের ইতিহাসের অংশ। কিন্তু তখন সেই মজলিসে বা অধিবেশনে বসা ঠিক নয়। সেখানে যাওয়া সবার কাজ নয়। যারা শুনে সেগুলোর রেকর্ড করা তাদের কাজ। কিন্তু সেই অধিবেশনে যাওয়া, সেই বৈঠকে বসা এটি সেই বৈঠকের সম্মানকে বৃদ্ধি করার নামান্তর। তিনি (রা.) বলেন, বিরোধীরা আমাদের সম্পর্কে যা লিখে তা আমরা লিখতে বাধ্য কেননা ভবিষ্যত প্রজন্মকে অবহিত করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। কিন্তু সেই অধিবেশনে বা বৈঠকে বসলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও কোন লাভ নেই আর বর্তমান যুগের মানুষেরও কোন লাভ হয় না। যারা এমন বৈঠকে যায় তারা নিজেদের আত্মাভিমানকে পদদলিত করে। তাই জামাতের বন্ধুদের আমি নসীহত করব, এই ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। এমন বৈঠকে যেন কেউ না যায়। অতএব একথা আজও আমাদের প্রবীণ ও নবীনদের স্মরণ রাখা উচিত আর কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এমন বৈঠক থেকে উঠে চলে আসা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং সঠিক পথ অনুসরণের তৌফিক দিন।

বিগত খুতবার প্রেক্ষাপটে কথা প্রসঙ্গে আমি আরো একটি কথা বলতে চাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাশী দূরীভূত হওয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা আমি তুলে ধরেছিলাম। এরপর একজন লিখেছেন, আমি যা পড়েছি তাতে কলা নয় বরং সেবের অর্থাৎ আপেলের কথা উল্লেখ আছে। যাহোক, ইলহাম পূর্ণ হওয়ার ছিল তা হয়েছে। (হুযূর বলেন), উভয় শব্দই এসেছে আর সেব বা আপেলের বর্ণনায়ও তিনি (রা.) বলেন, প্রথমে কলা খাচ্ছিলেন আমি বাঁধা দিলে তিনি খাওয়া বন্ধ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আপেল খাওয়া আরম্ভ করেন যা খলীফা রশীদ উদ্দিন সাহেব নিয়ে এসেছিলেন। আর সেই আপেল এত টক ছিল যে, একজন সুস্থ মানুষেরও তাতে কাশী হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি (আ.) মুচকি হেসে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কাশী ঠিক হয়ে গেছে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এই টক আপেল খেয়ে নিয়েছি। যাহোক আসল বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, দোয়ার মাধ্যমে রোগ দূর

হয়ে গেছে। এখন অন্য কোন কিছু আর ক্ষতি করতে পারবে না আর ক্ষতি করতে পারে নি। (হুযূর (আই.) বলেন), আমি এই কথা আপনাদের এজন্য বলছি কারণ একটি চিঠি এসে গেছে আর চিঠি যেন না আসে। মানুষ অন্য কোন স্থানে পড়ার পর আমাকে লিখতে পারে। আমার কাছে গত সপ্তাহেও সেই ঘটনা লিখিত ছিল কিন্তু আমি পড়িনি। যাহোক, কলা ও আপেল উভয়টির কথাই রয়েছে। আর উভয়টিই আমি উল্লেখ করেছি।

নামাযে জুমুআর পর একটি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব যা আমাদের একজন দরবেশ হাজী মনজুর আহমদ সাহেবের, যিনি গত পহেলা মে ২০১৫ তারিখে ৮৫ বছর বয়সে কাদিয়ানে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৯২৯ সনে শিয়ালকোট জেলার চানগ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা হযরত নিযামুদ্দিন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার মা-ও সাহাবীয়া ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর ভাইদের সাথে তিনি আসবাবপত্র বানানোর কাজ শিখেছিলেন। ১৯৪৭ সনে যখন পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণে খোদ্দামদের কাদিয়ানে ডাকা হয় তখন তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর তাহরীক অনুযায়ী কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ২৫ মাইলের অধিক পথ পায়ে হেঁটে ও গভীর পানি অতিক্রম করে লাহোরের রতনবাগে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে পৌঁছেন। সেখান থেকে ১৯৪৭ সনে বড় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে কাদিয়ানে পৌঁছান। প্রারম্ভিক দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বীরত্বের সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কষ্ট করে জামাতের খিদমত করেছেন। প্রথম দিকে বৃষ্টির কারণে যখন কিছু ছাদ এবং দেয়াল ধ্বসে পড়ে তখন তিনি যেহেতু কাজ জানতেন তাই কষ্ট করে সেগুলো মেরামত করেছিলেন। এভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হতে থাকে। যে কাজই তার ওপর ন্যস্ত হয়েছে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে সুন্দরভাবে সেই কাজ সমাধা করেছেন। বেহেশতী মকবেরার দেয়াল নির্মাণ, লাইব্রেরীর বই-পুস্তকের হিফাযতের ব্যবস্থা করা এসব দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। কাদিয়ানের পুরো পরিবেশকে অনুকূল করার জন্য তিনি অমুসলমানদের সাথেও যোগাযোগ করেন, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মন জয় করেন। খুবই ভাল একজন কারিগর ছিলেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার রাজমিস্ত্রির কাজের নিগরানী ছাড়াও সকল প্রকার কাঠের কাজ করতে জানতেন। প্রয়োজন অনুসারে নিজের মননশীলতাকে কাজে লাগিয়ে কাজ করার জন্য ভাল উপায় বের করে করতেন। তিনি মিনারাতুল মসীহ্তে মর্মর পাথর লাগানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন। মর্মরের ভারী স্ল্যাব উপরে উঠানোর জন্য তিনি কাঠের স্ট্যান্ড এবং দেশীয় যন্ত্র বানিয়েছিলেন কেননা তখন ভারী জিনিস উপরে উঠানোর অন্য কোন উপায় ছিল না। এর মাধ্যমে পুরো মিনারে এই স্ল্যাব লাগিয়েছেন। ওপরের গম্বুজ বানানো কঠিন কাজ ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন। একইভাবে শ্রী নগর, জম্মু, মস্কার এবং সানদানের মসজিদ ও দিল্লীর মসজিদ এবং মিশন হাউসের অসাধারণ নির্মাণ কাজ বড় প্রজ্ঞার সাথে করার তৌফিক পেয়েছেন। বছরের পর বছর জলসা সালানার তাবু খাঁটানোর কাজও করেছেন। জামাতী ধন-সম্পদ রক্ষা করার গভীর আন্তরিকতা ছিল। আর সবসময় মান বজায় রেখে স্বল্প খরচে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতেন। ১৯৯২ সনে বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ্ব করার সৌভাগ্য হয়েছে। শেষদিন পর্যন্ত জামাতের প্রতিটি অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। বড় অনাড়ম্বরতার মাঝে নিদর্শন মূলকভাবে তাঁর বিয়ে হয়েছে। তার স্ত্রীও খুবই অস্বচ্ছলতার মাঝে ধৈর্য্য ও সহ্যের সহিত জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন। তাঁর ছয় ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে। সবাই বিবাহিত এবং সবার সন্তান-সন্ততি রয়েছে। তাঁর দুই ছেলে যৌবনেই ইন্তেকাল করেছে। এই দুঃখ তিনি পরম ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করেছেন। তার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার

পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান সন্ততিকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন। আমি যেভাবে বলেছি নামাযের পর তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।